যকের ধন

হেমেন্দ্রকুমার রায়

যকের ধন
হেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২০

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ১৮০ টাকা

Jakher Dhan by Hemendra Kumar Roy Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: August 2020
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 180 Taka RS: 180 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94933-9-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

কবি—বন্ধু নরেন দেব করকমলে

এক

মড়ার মাথা

ঠাকুরদাদা মারা গেলে পর, তাঁর লোহার সিন্দুকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটি ছোট বাক্স পাওয়া গেল। সে বাক্সের ভেতরে নিশ্চয়ই কোনো দামি জিনিস আছে মনে করে মা সেটি খুলে ফেললেন। কিন্তু তার মধ্যে পাওয়া গেল শুধু একখানা পুরনো পকেট-বুক, আর একখানা ময়লা-কাগজে-মোড়া কী একটা জিনিস। মা কাগজটা খুলেই জিনিসটা ফেলে দিয়ে হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, "কী, কী হোলো মা?"

মা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "কুমার, শিগগির ওটা ফেলে দে!"

আমি হেঁট হয়ে চেয়ে দেখলুম, একটা মড়ার মাথার খুলি মাটির ওপরে পড়ে রয়েছে! আশ্চর্য হয়ে বললুম, "লোহার সিন্দুকে মড়ার মাথা! ঠাকুরদা কি বুড়ো বয়সে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন?"

মা বললেন, "ওটা ফেলে দিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করবি চল?"

মড়ার মাথার খুলিটা জানালা গলিয়ে আমি বাড়ির পাশের একটা খানায় ফেলে দিলুম। পকেট-বুকখানা ঘরের একটা তাকের ওপর তুলে রাখলুম। মা বাক্সটা আবার সিন্দুকে রাখলেন। ...

দিন-কয়েক পরে পাড়ার করালী মুখুয্যে হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। করালী মুখুয্যেকে আমাদের বাড়িতে দেখে আমি ভারি অবাক হয়ে গেলুম। কারণ আমি জানতুম যে ঠাকুরদাদার সঙ্গে তাঁর একটুও বনিবনা ছিল না, তিনি বেঁচে থাকতে করালীকে কখনো আমাদের বাড়িতে দেখিনি।

করালীবাবু বললেন, "কুমার, তোমার মাথার ওপরে এখন আর কোনো অভিভাবক নেই। তুমি নাবালক। হাজার হোক তুমি তো আমাদেরই পাড়ার ছেলে। এখন আমাদের সকলেরই উচিত, তোমাকে সাহায্য করা। তাই আমি এসেছি।"

করালীবাবুর কথা শুনে বুঝলুম, তাঁকে আমি যতটা খারাপ লোক বলে ভাবতুম, আসলে তিনি ততটা খারাপ লোক নন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, "যদি কখনো দরকার হয়, আমি আপনার কাছে আগে যাব।"

করালীবাবু বসে বসে এ কথা সে কথা কইতে লাগলেন। কথা প্রসঙ্গে আমি তাঁকে বললুম, "ঠাকুরদাদার লোহার সিন্দুকে একটা ভারি মজার জিনিস পাওয়া গেছে।"

করালীবাবু বললেন, "কী জিনিস?"

আমি বললুম, "একটা চন্দন-কাঠের বাক্সের ভেতরে ছিল একটা মড়ার মাথার খুলি—"

করালীবাবুর চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "মড়ার মাথার খুলি?"

—"হ্যাঁ, আর একখানা পকেট-বই।"

—"সে বাক্সটা এখন কোথায়?"

—"লোহার সিন্দুকেই আছে।"

করালীবাবু তখনই সে কথা চাপা দিয়ে অন্য কথা কইতে লাগলেন। কিন্তু আমি বেশ বুঝলুম, তিনি যেন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। খানিক পরে তিনি চলে গেলেন।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। শুনলুম আমার কুকুর বাঘা ভয়ানক চিৎকার করছে। বিরক্ত হয়ে দু-চারবার ধমক দিলুম, কিন্তু আমার সাড়া পেয়ে বাঘার উৎসাহ আরও বেড়ে উঠল। সে আরও জোরে চ্যাঁচাতে লাগল।

তারপরেই, যেন কার পায়ের শব্দ পেলুম। কে যেন দুড়-দুড় করে ছাদের ওপর দিয়ে চলে গেল। ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। চারদিকে খোঁজ করলুম, কারুকেই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম আমারি ভ্রম। বাঘার গলার শিকল খুলে দিয়ে, আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম! ...

সকাল বেলায় ঘুম ভেঙেই শুনি মা ভারি চ্যাঁচামেচি লাগিয়েছেন! বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম "ব্যাপার কী মা?"

মা বললেন "ওরে, কাল রাত্তিরে বাড়িতে চোর এসেছিল!"

তাহলে কাল রাত্রে যা শুনেছিলুম তা ভুল নয়!

মা বললেন, "দেখবি আয়, বড় ঘরে লোহার সিন্দুক খুলে রেখে গেছে!"

ঘরে গিয়ে দেখি, সত্যিই তাই! কিন্তু চোর বিশেষ-কিছু নিয়ে যেতে পারেনি কেবল সেই চন্দন কাঠের বাক্সটা ছাড়া।

কিন্তু মনে কেমন একটা ধোঁকা লেগে গেল! সিন্দুকে এত জিনিস থাকতে চোর খালি বাক্সটা নিয়ে গেল? আরে মনে পড়ল, কাল সকালে এই বাক্সের কথা শুনেই করালী বাবু কী রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন! তবে কি এই বাক্সের মধ্যে কোনো রহস্য আছে? সম্ভব। নইলে, একটা মড়ার মাথার খুলি কে আর এত যত্ন করে লোহার সিন্দুকের ভেতরে রেখে দেয়?

মাকে কিছু না বলেই তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটলুম। বাড়ির পাশের খানাটার মুখে গিয়ে দেখলুম, মড়ার মাথার খুলিটা একরাশ জঞ্জালের ওপরে কাত হয়ে পড়ে আছে! সেটাকে আর একবার পরখ করবার জন্য তুলে নিলুম। খুলির এক পিঠে গাঢ় কালো রং মাখানো ছিল—কিন্তু খানার জল লেগে মাঝে মাঝে রং উঠে গেছে! আর যেখানেই রং নেই, সেইখানেই আঁকের মতন কী কতকগুলো খোদা রয়েছে। অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে খুলিটাকে লুকিয়ে আবার বাড়িতে আনলুম। সাবান-জলে সেটাকে বেশ করে ধুয়ে ফেলতেই কালো রং উঠে গেল। তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলুম খুলির এক পিঠের সবটায় কে অনেকগুলো অঙ্ক খুদে রয়েছে। অঙ্কগুলো এই রকম :

৩৬(২)
১৮(২)

---

(১)৩০
৫
(১)৪০
৩৯

---

(৩)৩৩
১৯
(১)৩২

৪৪
৩৯
৪০
১৫(২)
১৯

৩৭
৫
৪০
(১)৩০
৪২

---

(১)২৯
(১)১৩

৩৩
৫
৩৫
(৩)৩০
(১)১৩

৩০
৪২
১৫
২০

৯
(৩)১৫
(১)৪৮

২৯(২)
৩৭
(১)৩৫
২৫(২)

৩
(১)৩২
২
২৩
১৫
১০

৯
(৩) ১৫
(১)৪৮

৩৫
৫
৩০
৩১
(১) ৩০
৩৫

৩৫(২)
(১) ৩৭

১৯
৪৮
১৫
২০

৯
(৩)১৫
(১)৪৮

---

(৩)২৮
৩২
১৪(২)
৩২(২)

৩৩(২)
২৯
৩৯

২৮(২)
৩৯

২৮
৪৪(২)
৪৮

৪৪(২)
২৮
৪৫(২)
২৮

২০
(৩)৩৭

৫২
১৪
৫
৪৬
(১)৪০

৩৩
২৯

৩৩(২)
(১)৫

দুই
যকের ধন

এই অদ্ভুত অঙ্কগুলোর মানে কী? অনেক ভাবলুম, কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না।

হঠাৎ মনে পড়ল ঠাকুরদাদার পকেট-বইয়ের কথা। সে-খানাও তো এই খুলির সঙ্গে ছিল, তার মধ্যে এই রহস্যের কোনো সদুত্তর নেই কি?

তখনি উপরে গিয়ে তাক থেকে পকেট-বইখানা পাড়লুম। খুলে দেখি, তার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লেখায় ভরতি। গোড়ার দিকের প্রায় ষোলো-সতেরো পাতা পড়লুম, কিন্তু সে সব বাজে কথা। তারপর হঠাৎ এক জায়গায় দেখলুম :

"১৩১০ সাল, আশ্বিন মাস। আসাম থেকে ফেরার মুখে একদিন আমরা এক বনের ভেতর দিয়ে আসছি। সন্ধ্যা হয়-হয়,—আমরা এক উঁচু পাহাড়ে-জমি থেকে নামছি। হঠাৎ দেখি খানিক তফাতে একটা মস্ত বড় বাঘ! সে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে যেন কার ওপরে লাফিয়ে পড়বার জন্য তাগ করছে!—আরও একটু তফাতে দেখলুম, একজন সন্ন্যাসী পথের পাশে, গাছের তলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বাঘটার লক্ষ্য তাঁর দিকেই!

আমি তখনি চিৎকার করে উঠলুম। আমার সঙ্গের কুলিরাও সে চিৎকারে যোগ দিল। সন্ন্যাসীর ঘুম ভেঙে গেল, বাঘটাও চমকে ফিরে আমাদের দেখে এক লাফে অদৃশ্য হলো।

সন্ন্যাসী জেগে উঠেই ব্যাপারটা সব বুঝে নিলেন। আমার কাছে এসে কৃতজ্ঞ স্বরে বললেন, "বাবা, তোমার জন্যে আজ আমি বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গেলুম।"

আমি বললুম, "ঠাকুর, বনের ভেতরে এমনি করে কি ঘুমোতে আছে?"

সন্ন্যাসী বললেন, "বনই যে আমাদের ঘর-বাড়ি বাবা!"

আমি বললুম, "কিন্তু এখনি যে আপনার প্রাণ যেত!"

সন্ন্যাসী বললেন, "কৈ বাবা, গেল না তো। ভগবান ঠিক সময়েই তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন।"

শুনলুম, আমরা যেদিকে যাচ্ছি, সন্ন্যাসীও সেই দিকে যাবেন। তাই সন্ন্যাসীকেও আমরা সঙ্গে নিয়ে চললুম।

সন্ন্যাসী দুদিন আমাদের সঙ্গে রইলেন। আমি যথাসাধ্য তাঁর সেবা করতে ত্রুটি করলুম না। তিন দিনের দিন বিদায় নেবার আগে তিনি আমাকে বললেন,

"দেখ বাবা, তোমার সেবায় আমি বড় তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার প্রাণরক্ষাও করেছ। যাবার আগে আমি তোমাকে একটি সন্ধান দিয়ে যেতে চাই।"

আমি বললুম, "কীসের সন্ধান?"

সন্ন্যাসী বললেন, "যকের ধনের।"

আমি আগ্রহের সঙ্গে বললুম, "যকের ধন! সে কোথায় আছে ঠাকুর?"

সন্ন্যাসী বললেন, "খাসিয়া পাহাড়ে।"

আমি হতাশভাবে বললুম, "কোনখানে আছে আমি তা জানব কেমন করে?"

সন্ন্যাসী বললেন, "আমি ঠিকানা বলে দিচ্ছি, খাসিয়া পাহাড়ের রূপনাথের গুহার নাম শুনেছ?"

আমি বললুম, "শুনেছি। প্রবাদে আছে যে, এই গুহার ভেতর দিয়ে চীনদেশে যাওয়া যায়, আর অনেকবার আগে এক চীনসম্রাট এই গুহাপথে নাকি সসৈন্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসেছিলেন।"

সন্ন্যাসী বললেন, "হ্যাঁ। এই রূপনাথের গুহা থেকে পঁচিশ ক্রোশ পশ্চিমে গেলে, উপত্যকার মাঝখানে একটি সেকেলে মন্দির দেখতে পাবে। সে মন্দির এখন ভেঙে পড়েছে, কিছুদিন পরে তার কোনো চিহ্নও হয়তো আর পাওয়া যাবে না। এক সময়ে এখানে মস্ত এক মঠ ছিল, তাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা থাকতেন। সেকালের এক রাজা বিদেশি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করবার আগে এই মঠে নিজের সমস্ত ধন-রত্ন গচ্ছিত রেখে যান। কিন্তু যুদ্ধে তাঁর হার হয়। পাছে নিজের ধন-রত্ন শত্রুর হাতে পড়ে, সেই ভয়ে রাজা সে সমস্ত এক জায়গায় লুকিয়ে এক যককে পাহারায় রেখে পালিয়ে যান। তারপর তিনি আর ফিরে আসেননি। সেই ধন-রত্ন এখনও সেখানেই আছে"—তারপর সন্ন্যাসী আমাকে বৌদ্ধ মঠে যাবার পথের কথা ভালো করে বলে দিলেন।

আমি বললাম, "কিন্তু এতদিনে আর কেউ যদি সেই ধন-রত্নের সন্ধান পেয়ে থাকে।"

সন্ন্যাসী বললেন, "কেউ পায়নি। সে বড় দুর্গম দেশ, সেখানে যে বৌদ্ধ মঠ আছে, তা কেউ জানে না, আর কোনো মানুষও সেখানে যায় না! মঠে গেলেও, সারা জীবন ধরে ধনরত্ন খুঁজলেও কেউ পাবে না। কিন্তু তোমাকে সেখানে গিয়ে খুঁজতে হবে না; ধনরত্ন ঠিক কোনখানে পাওয়া যাবে, তা জানবার উপায় কেবল আমার কাছে আছে।" এই বলে সন্ন্যাসী তাঁর ঝোলা থেকে একটা মড়ার খুলি বের করলেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললেম, "ওতে কী হবে ঠাকুর?"

সন্ন্যাসী বললেন, "যে যক ধনরত্নের পাহারায় আছে, এ তারই মাথার খুলি! এই খুলিতে আমি মন্ত্র পড়ে দিয়েছি, এ খুলি যার কাছে থাকবে, যক তাকে আর কিছুই বলবে না। খুলিতে এই যে অঙ্কের মতো রেখা রয়েছে, এ হচ্ছে সাংকেতিক ভাষা। এই সংকেত বুঝবার উপায়ও আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, তাহলেই তুমি

জানতে পারবে ঠিক কোনখানে ধনরত্ন আছে।" এই বলে সন্ন্যাসী আমাকে সঙ্কেত বুঝবার গুপ্ত উপায় বলে দিলেন।

তারপর এক বৎসর ধরে অনেক ভাবলুম। কিন্তু একলাটি সেই দুর্গম দেশে যেতে ভরসা হলো না। শেষটা আমার প্রতিবেশী করালীকে বিশ্বাস করে সব কথা জানিয়ে বললুম, "করালী, তোমার জোয়ান বয়স, তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে তোমাকেও ধনরত্নের অংশ দেব।"

কিন্তু করালী যে বেইমান, আমি তা জানতুম না। সে ফাঁকি দিয়ে মড়ার মাথার খুলিটা আমার কাছ থেকে আদায় করবার চেষ্টায় রইল। দু-একবার লোক লাগিয়ে চুরি করবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু পারেনি। ভাগ্যে আমি তাকে যকের ধনের ঠিকানাটা বলে দিইনি।

কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ে যাবার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। এই বুড়ো বয়সে টাকার লোভে একলা সেই অজানা দেশে গিয়ে শেষটা কি বাঘ-ভাল্লুক-ডাকাতের পাল্লায় প্রাণ খোয়াব? অন্য কারুকে সঙ্গে নিতেও ভরসা হয় না,—কে জানে, টাকার লোভে বন্ধুই আমাকে খুন করবে কিনা!

তবে এই পকেট-বইয়ে আমি সব কথা লিখে রাখলুম। ভবিষ্যতে এই লেখা হয়তো আমার বংশের কারুর উপকারে আসতে পারে। কিন্তু আমার বংশের কেউ যদি সত্যিই সেই বৌদ্ধ মঠে যাত্রা করে, তবে যাবার আগে যেন বিপদের কথাটাও ভালো করে ভেবে দেখে। এ কাজে পদে পদে প্রাণের ভয়।"

পকেট-বইখানা হাতে করে আমি অবাক হয়ে বসে রইলুম।

তিন
সংকেতের অর্থ

উঃ! করালীবাবু কি ভয়ানক লোক! ঠাকুরদাদার সঙ্গে সে চালাকি করতে গিয়েছিল, কিন্তু পেরে ওঠেনি। তারপর এতদিনেও সে আশা ছাড়েনি। আমি বেশ বুঝলুম, এই মড়ার মাথাটা কোথায় আছে তা জানবার জন্যেই করালী কাল আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল! রাত্রে এইটে চুরি করবার ফিকিরেই যে আমাদের বাড়িতে চোর এসেছিল, তাতেও আর কোনো সন্দেহ নেই। ভাগ্যে মড়ার মাথাটা আমি বাড়ির পাশের খানায় ফেলে দিয়েছিলুম!

এখন কী করা উচিত? গুপ্তধনের চাবি তো এই খুলির মধ্যেই আছে, কিন্তু অনেকবার উল্টেপাল্টে দেখেও আমি সেই অঙ্কগুলোর ল্যাজ-মুড়ো কিছুই বুঝতে পারলুম না। পকেট-বইখানার প্রত্যেক পাতা উল্টে দেখলুম, তাতেও ঠাকুরদাদা এই সংকেত বুঝবার কোনো উপায় লিখে রাখেননি। ঠাকুরদাদার ওপরে ভারি রাগ হলো। আসল ব্যাপারটাই জানবার উপায় নেই।

তারপর ভেবে দেখলুম, জেনেই বা কী আর এমন হাতি-ঘোড়া লাভ হতো! আমার বয়স সতেরো বৎসর। সেকেন্ড-ইয়ারে পড়ছি। জীবনে কখনো কলকাতার বাইরে যাইনি। কোথায় কোন কোণে আসাম আর খাসিয়া পাহাড়, আবার তার ভেতরে কোথায় আছে "রূপনাথের গুহা"—এ-সব খুঁজে বের করাই তো আমার পক্ষে অসম্ভব! তার উপরে সেই গভীর জঙ্গল, সেখানে দিন-রাত বাঘ-ভাল্লুক-হাতিরা হানা দিচ্ছে! সেকেলে এক বৌদ্ধ মঠ, তার ভেতরে যকের ধন—সেও এক ভুতুড়ে কাণ্ড! শেষটা কি একলা সেখানে গিয়ে আলিবাবার ভাই কাসিমের মতন টাকার লোভে প্রাণটা খোয়াব? এ-সব ভেবেও বুকটা ধুকপুক করে উঠল!

হঠাৎ মনে হলো বিমলের কথা। বিমল আমার প্রাণের বন্ধু, আমাদের পাড়ার ছেলে। আমার চেয়ে সে বয়সে বছর-তিনেকের বড়, এ-বৎসরে বি.এ দেবে। বিমলের মতো চালাক ছেলে আমি আর দুটি দেখিনি। তার গায়েও অসুরের মতন জোর, রোজ সে কুস্তি লড়ে—দুশ ডন, তিনশ বৈঠক দেয়। তার উপরে এই বয়সে সে অনেক দেশ বেড়িয়ে এসেছে—এই গেল বছরেই তো আসামে বেড়াতে গিয়েছিল। তার কাছে আমি কোনো কথা লুকোতুম না! ঠিক করলুম, যাওয়া হোক আর নাই হোক একবার বিমলকে এই মড়ার মাথাটা দেখিয়ে আসা যাক।

বৈকালে বিমলের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম—তখন সে বসে বসে বন্দুকের

নল সাফ করছিল! আমাকে দেখে বললে, "কিহে, কুমার যে! কী মনে করে?"

আমি বললুম, "একটা ধাঁধা নিয়ে ভারি গোলমালে পড়েছি ভাই!"

বিমল বললে, "কী ধাঁধা?"

আমি মড়ার মাথার খুলিটা বের করে বললুম, "এই দেখ!"

বিমল অবাক হয়ে খুলিটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, "এ আবার কী?"

আমি পকেট-বইখানা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, "আমার ঠাকুরদার পকেট-বই। পড়লেই সব বুঝতে পারবে।"

বিমল বললে, "আচ্ছা বোসো, আগে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা সাফ করে নিই। কাল পাখি-শিকারে গিয়েছিলুম। বন্দুকে ভারি ময়লা জমেছে।"

বন্দুক সাফ করে, হাত ধুয়ে বিমল বললে, "ব্যাপার কী বলো দেখি কুমার? তুমি কি কোনো তান্ত্রিক গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছ? তোমার হাতে মড়ার মাথা কেন?"

আমি বললুম, "আগে পকেট-বইখানা পড়েই দেখ না!"

"বেশ" বলে বিমল পকেট-বইখানা নিয়ে পড়তে লাগল। খানিক পরেই দেখলুম, বিমলের মুখ বিস্ময়ে আর কৌতূহলে ভরে উঠেছে।

পড়া শেষ করেই বিমল তাড়াতাড়ি মড়ার মাথাটা তুলে নিয়ে সেটাকে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলে। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "ভারি আশ্চর্য-তো!"

আমি বললুম, "অঙ্কগুলো কিছু বুঝতে পারলে?"

বিমল বললে, "উহু!"

—"আমিও পারিনি।"

—"কিন্তু আমি এত সহজে ছাড়ব না। তুমি এখন বাড়ি যাও, কুমার! খুলিটা আমার কাছেই থাক। আমি এটার রহস্য জানবই! তুমি কাল সকালে এসো।"

আমি বললুম, "কিন্তু সাবধান।"

বিমল বললে, "কেন?"

আমি বললুম, "করালী মুখুয্যে এই খুলিটা চুরি করবার জন্যে কাল আমাদের বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিল।"

বিমল বললে, "করালী? তার কোনো লোকের এত সাহস হবে না যে, আমার বাড়িতে মাথা গলাবে।"

—"তা আমি জানি। তবু সাবধানে মার নাই।" এই বলে আমি চলে এলুম।

পরের দিন ভোর না হতেই বিমলের কাছে ছুটলুম। তার বাড়িতে আমার অবারিত দ্বার। একেবারে তার পড়বার ঘরে গিয়ে দেখি, বিমল টেবিলের ওপর হেঁট হয়ে এক মনে কী লিখছে, আর সামনেই মড়ার মাথাটা পড়ে রয়েছে। আমার পায়ের শব্দে চমকে তাড়াতাড়ি সে খুলিটাকে তুলে নিয়ে লুকিয়ে ফেলতে গেল—

তারপর আমাকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে হেসে বললে, "ওঃ, তুমি! আমি ভেবেছিলুম অন্য কেউ!"

—"কাল তো অতো সাহস দেখালে, আজ এত ভয় পাচ্ছ কেন?"

—"কাল? কাল সবটা ভালো করে তলিয়ে বুঝিনি। আজ বুঝছি, আমাদের এখন সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে—কাকপক্ষী যেন টের না পায়।"

—"অঙ্কগুলো দেখে কিছু বুঝলে?"

—"যা বোঝা উচিত সব বুঝেছি।"

আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠলুম! চেঁচিয়ে বললুম, "সব বুঝতে পেরেছ! সত্যি?"

বিমল বললে, "চুপ! চেঁচিয়ো না! কে কোথায় শুনতে পাবে বলা যায় না। ঠাণ্ডা হয়ে ঐখানে বোসো।"

আমি একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললুম, "খুলিতে কী লেখা আছে, আমাকে বলো।"

বিমল আস্তে আস্তে বললে, "প্রথম আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টা করে যখন আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছি, তখন হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগে একখানা ইংরাজি বই পড়েছিলুম। তাতে নানারকম সাংকেতিক লিপির গুপ্তরহস্য বোঝানো ছিল। তাতেই পড়েছিলুম যে ইউরোপের চোর-ডাকাতরা প্রায়ই একরকম সংকেত ব্যবহার করে। তারা Alphabet অর্থাৎ বর্ণমালাকে যথাক্রমে সংখ্যা অর্থাৎ ১, ২, ৩ হিসাবে ধরে। অর্থাৎ one হবে A, two হবে B, three হবে C ইত্যাদি। আমি ভাবলুম হয়তো এই খুলিটাতেও সেই নিয়মে সংকেত সাজানো হয়েছে। তারপর দেখলুম, আমার অনুমান মিথ্যা নয়। তখন এই সংকেতগুলো খুব সহজেই পড়ে ফেললুম।"

আমি আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলুম, "পড়ে কী বুঝলে বলো?"

বিমল আমার হাতে একখানা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললে, "খুলির সংকেতগুলো ছাব্বিশটা ঘরে ভাগ করা। আমিও লেখাগুলো সেই ভাবেই সাজিয়েছি।"

কাগজের ওপরে এই কথাগুলো লেখা ছিল :

"ভাঙা	দেউলের	পিছনে	সরলগাছ	মুলদেশ	থেকে
পুবদিকে	দশগজ	এগিয়ে	থামবে	ডাইনে	আটগজ
এগিয়ে	বুদ্ধদেব	বামে	ছয়গজ	এগিয়ে	তিনখানা
পাথর	তার	তলায়	সাতহাত	জমি	খুঁড়লে
পথ	পাবে"				

আমি চিঠিখানা পড়ে মনে মনে বিমলের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলুম।

বিমল বললে, সাংকেতিক লিপিটা তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিই, শোনো। আমাদের বাংলা ভাষায় "অ" থেকে শুরু করে "ঁ" পর্যন্ত বাহান্নটি বর্ণ।

সেই বর্ণগুলোকে ১, ২, ৩ হিসাবে যথাক্রমে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ১ হচ্ছে অ, ২ হচ্ছে আ, ১৩ হচ্ছে ক, ৫২ হচ্ছে ঁ প্রভৃতি।

যেখানে 'আ'-কার বা 'এ'-কার প্রভৃতি আছে, সেখানে বর্ণের যে-পাশে দরকার, সেইপাশে ব্রাকেটের ভেতর সংখ্যা লেখা হয়েছে। উদাহরণ দেখ :- 'ভ'বর্ণের সংখ্যা ৩৬, আর 'আ-কারের সংখ্যা হচ্ছে ২। অতএব, ৩৬ (২) সংকেতে বুঝতে হবে "ভা"। 'দ' বর্ণের সংখ্যা ৩০, 'এ'-কারের সংখ্যা হচ্ছে ৯। অতএব "দে" বোঝাতে লিখতে হবে (৯) ৩০। "উ"-কার বর্ণের তলায় বসে। সুতরাং $\overset{৩৫}{\underset{৫}{\smile}}$ থাকলে বুঝতে হবে "বু"। "উ"র মতো "উ"-কারেরও সংখ্যাও হচ্ছে ৫। চন্দ্রবিন্দুর সংখ্যা বাহান্ন, চন্দ্রবিন্দু উপরে বসে, কাজেই "খুঁ"র সংকেত $\overset{৫২}{\underset{১৪}{\smile}}$। যুক্ত-অক্ষরকে আলাদা করে ধরা হয়েছে, যেমন—"বুদ্ধদেব"। যিনি এ সংখ্যাগুলো লিখেছেন, তাঁর বানান-জ্ঞান ততটা টনটনে নয়। কেননা "মূল" ও "পূব" তাঁর হাতে পড়ে হয়েছে—"মুল" ও "পুব"। উর মতো ঊ-কারের সংখ্যা হচ্ছে ৬। কিন্তু তিনি উ-কারের সংখ্যা ঊ-কারের ৬-এর স্থানে বসিয়েছেন—বর্ণের তলাকার ব্রাকেটে।"

আমি মড়ার মাথার খুলিটা আর একবার পরখ করবার জন্যে তুলে নিলুম—কিন্তু দৈগতিকে হঠাৎ সেখানা ফসকে মার্বেল বাঁধানো মেঝের ওপরে সশব্দে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেটা উঠিয়ে নিয়ে, তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আমি বলে উঠলুম, "ঐঃ যাঃ! খুলিটার খানিকটা চটে গিয়েছে।"

বিমল বললে, "কোনখানটা?"

আমি বললুম, "গোড়ার চারটে ঘর—ভাঙা দেউলের পিছনে সরলগাছ—পর্যন্ত?"

বিমল বললে, "এই কাণ্ডটি যদি আগে ঘটত তাহলে সমস্তই মাটি হয়ে যেত। যাক, তোমার কোনো ভয় নেই,—সংকেতগুলো আমি কাগজে টুকে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের সাবধান হতে হবে, অঙ্কগুলো রেখে কথাগুলো এখনি নষ্ট করে ফেলাই উচিত।"—এই বলে সে সংকেতের অর্থ-লেখা কাগজখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে।

যখন দরকার হবে, পাঁচ মিনিটের চেষ্টাতেই সংকেতের অর্থ আমরা ঠিক বুঝতে পারব,—কিন্তু বাইরের কোনো লোক খুলির সংকেত দেখে কিছুই ধরতে পারবে না।